ছোটগল্প

অতনু রায়

BANGLADARSHAN.COM

॥একটু মাটি॥

আব্বা! আব্বা!–দৌড়াতে দৌড়াতে করিম বাড়ি যায়। তার রুদ্ধশ্বাস।

–কি হয়েছে করিম হাঁফাচ্ছিস কেন?

–সর্বনাশ হয়েছে আব্বা! পুবদিকে গাঙপাড়ে বাঁধ ভেঙেছে।

–এ কি সর্বনাশ! হায় আল্লা।

–কি করবে এখন করিমের বাপ।

–আব্বা-আম্মি কোটাল পাড়ার উঁচু ঢিবির ওপরে সব যাবে বলছে।

–কোত্থুকে যাব নাই। আসুক পানি। মরতে হলে এখেনেই মরবো। গাঙের পানি দেওয়াল ভেঙ্গে গোর দিক।
–কেঁদে কি করবে করিমের বাপ আল্লাযখন মেহের নন। সবাই যেখানে যাবে আমাদেরও সেখানেই যেতে হবে। গাইয়ের দড়িটা তোর বাপজানকে দে, টিয়ের খাঁচাটাও দিয়ে দে। করিম, তোরঙ্গখানা আনিস।

দেখতে দেখতে ডোবা-পুকুর-গড়ে ভাসিয়ে থই থই পানি। এই ছোট গাঁয়ের ক'জনই বা লোক। তাতেই ছোটাছুটি আর দৌড়াদৌড়ি। গোলার ধান গোলাতেই থেকে যায়। স্রোতের বেনোপানি শূন্য ঘরেতে আছড়ে মরে। জীবনের আবাসন ভেঙ্গে চাপা পড়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। ভেসে যায় ঘরের চাল, পালিত পশু, গোখাদ্য খড়-বিচালি, বাসনপএ। নারী শিশুর কান্নায় কোটাল পাড়ার ঢিবি তখন ক্লান্ত।

BANGLADARSHAN.COM

বেলা শেষের আগেই জীবনের অনিশ্চয়তার সঙ্গে প্রতাপী সূর্য কালো মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকলো।
শুরু হল অঝোরে বৃষ্টি। রাতের আঁধারে কিছুই নজরে আসে না। চারপাশে শুধু প্রিয়জনের হতাশার কান্না।

ঠিক দুই দিন আগে করিমের শাদি ঠিক হয়েছে। বর্ষা শেষে এই আশ্বিনে। দিনাজপুরে করিমের চাচার মেয়ে, মেহেদি। একরাশ নবজীবনের স্বপ্নবোনা দুই চোখ এই আঁধারে নিজকেও দেখা যায় না। করিম বলে, পানি নামলে বুকের হৃৎপিন্ডটা হিম হয়ে যাবে।

তিন দিন ধরে আসমানী শামিয়ানার তলে থাকা করিম চিৎকার করে ওঠে, আম্মি! সাপ। আম্মি সাপ কামড়ালো।
করিমের কান্না ঝড়ের মতো আছড়ে পড়ল আব্বু-আম্মির বুকে। দিশেহারা বাপ ছেলের পায়ে বাঁধন দেয়। বিরিন ওঝা, কেউ তাকে খবর দাও না!–করিমের আম্মি আকুতি কান্নার সাথে ভেসে যায়। স্বাস্থ্যসেবার কমপাউন্ডার বাবুও নেই। ঘরে তালা ঝুলিয়ে কোথায় যেন গেছেন। বাঁধনের গেরো ফুটো করে একটু একটু করে বিষ মেশে করিমের রক্তে। সে জ্বলায় যুবক করিম জবাই এর পশুর মতো ছটফট করে। আম্মির চোখের জল আব্বার দীর্ঘশ্বাস দিক হারিয়ে ফিরে যায়। আব্বার দেওয়া বাঁধন করিমের জীবন ফেরাতে পারে না। তার গৌরবর্ণ দেহ নীল হয়ে যায়। সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে বিষ মুখ দিয়ে উঠতে থাকে। কারোর কোন কথা করিমের কানে পৌঁছায় না। ধীরে ধীরে করিমের শরীর নিথর হয়ে যায়।

স্থবিরতার সাথে কেটে যায় অনেকটা সময়। ঢিবির ওপর আশ্রয় নেওয়া অবলা জীবগুলো পযর্ন্ত শোকাহত। খানিক আগে বৃষ্টি থেমেছে। সবকিছু চুরমার করে আকাশে সূর্য উঁকি দেয়। স্তব্ধতা ভেঙ্গে রফিক চাচা বলে, ছেলেকে গোর দিও না কাশিম। সাপে কেটেছে। হিঁদুদের মতো ভাসাই দাও। আল্লা দয়ালু, যদি ফেরত পাঠায়!

–যে যায় সে ফেরত আসে না। বিষের জ্বলায় করিম ছটফট করেছে।

–মাটি কোথা কাশিম। নজরবার অবধি পানি।

–ও কাজ করতে বলোনা চাচা। মাটি যেভাবেই হোক খুঁজে বের করব। সেখানেই আমার করিম রে....

কাশিম নৌকা বইতে থাকে। সঙ্গে সে কাউকে নেয় না এমনকি করিমের আম্মিকেও না। কশিম বলে, বাপ হয়ে ছেলেরে বাঁচাতে পারি নাই তখন প্রায়শ্চিত্ত করার ভারও আমার একার। একভাবে নৌকা বাইতে বাইতে কাশিম মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ছেলের শবদেহ কোলে তুলে আল্লার উদ্দেশ্যে বলে, হে আল্লা বাপ হয়ে ছেলেরে গোর দিতে পারছি না। দুই দিন হয়ে গেল। এবার যে করিমরে পচান ধরবে। আজ যদি মাটি না পাই তাহলে এই নৌকা ডুবিয়ে আমিও মরবো। আল্লা, তুমি এতে কঠোর! আজ যদি আমি মরি করিমের আম্মি কার জন্য বাঁচবে। তার মৃত্যুর কারন যে আমি হয়ে যাব। দুঃখ যদি দেবে তবে কেন আমাকে পাষাণে গড়লে না আল্লা।.....

BANGLADARSHAN.COM

॥মুখাগ্নি॥

রবিনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সাত সকাল। কি মনে হয়, সে সদর দরজা খুলে বাইরে বের হয়। বাড়ির সকলে তখন ঘুমন্ত। গতকাল বিকেলে সে কলকাতা থেকে ফিরেছে। সপ্তাহন্তে সে কর্মস্থল থেকে বাড়ি আসে।

রবিনকে আসতে দেখে গদাইয়ের বউ গোবর ছড়া দেওয়া বন্ধ রেখে ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ায়। গোঁসাই পুকুরে স্নান সেরে একজন স্ত্রীলোক ভিজে কাপড়ে রবিনের পাশ দিয়ে চলে রায়। পিছনে রেখে যায় কাপড় ধোয়া জলে পায়ের ছাপ। সামনে খোলা মাঠ। কতদিন পর আজ রবিন এখানে এলো।

–নাতি!

–কে?

কাঁপা কাঁপা তার গলা। এ স্বর আগে কখনো সে শোনেনি। রবিন পিছনে তাকাতে চমকে ওঠে। এ যে কানা ডাইনি।

কানা ডাইনিকে গ্রামের লোকেরা গ্রামের ভেতর ঢুকতে দেয় না। ডাইনি শুধু কচি ছেলের মাথা খায় তাই নয় বড় মানুষদেরও মেরে ফেলে। তার কানা চোখের নজর যার ওপর পরে তার আর রক্ষা নেই। ডাইনির হাত থেকে নিজেদের ছেলেপুলেদের বাঁচতে গ্রামবাসীরা পালা করে একথালা ভাত নামিয়ে রেখে যায় আঁতুরগড়ার পাশে অশত্থতলায়। খানিক তা কাকপক্ষীতে খায়, খানিক কুকুর বিড়ালে। অবশিষ্ট কিছু বাঁচলে ডাইনি খায়।

–তুমি যে নাতি হও।

ডাইনি রবিনের চিবুকে হাত রেখে চুমু খায়।–আমি জানতাম তুমি আসবে।

–জানতে!

–নাতি সগ্যে দেবার বাতি।

মাঠের কচি ধানের শিষ ছিঁড়ে ডাইনি উলু উলু করে রবিনের মাথায় ছেঁটায়।–একবার যখন পেয়েচি আর কি ছাড়ি। আয়! আয় আমার সঙ্গে।

–কোথায়?

–রাজা হরিশচন্দ্রের পেসাদে। সোনার পালঙ্কে থাকবি। ওদের রোজ বলি, বিশ্যেষই করে না।

–ওরা, কারা?

–ওই যে কচি কচি চাপা পড়া সব। বাপ হারামজাদা একবার পেছন ফেরে না। মর! মর!

কানা ডাইনি তার আস্তানার দিকে রবিনকে নিয়ে যায়। ধানের চারা রবিনের পা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি যেও না। ওর সঙ্গে যেতে নেই। বাতাস তার দিক বদল করে। তার ইশারা রবিন বুঝতে পারে না। দিনমানে কেউ এর ধারে কাছে আসে না। রাতবিরেতে কান্না ভেসে আসে।

–ওরে তোরা দ্যাক, কারে এনেচি। নাতি।

খিল খিল করে ডাইনি হেসে ওঠে।

কাদের সঙ্গে কথা বলছে, কেউ তো নেই। ডাইনি বিড় বিড় করে।

রবিনের শরীরটা কেমন করে ওঠে। নিজকে একটু সামলাতে গেলে ডাইনি বলে, দু দন্ড সবুর করতে পারছিস না। মর! মর! গা জ্বলুনি।

–কে!

আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, ওই যে লাল ড্যাবড্যাবে। মরলে গা জুড়ায়।

রবিনের হাত ধরে বলে, কথা দে আমার মুখে তুই আগুন দিবি নাতি।

এত স্পষ্ট কথা রবিন কোনদিন কারোর মুখে শোনেনি। কি এক দুঃসহ বেদনায় সকালটা ভরে গেল। নোংরামাখা শীর্ণ খসখসে হাতে রবিন হাত। সে ডাইনির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে কি বীভৎস তার মুখ। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে রবিন বলে, আমি তোমার কোনদিন কোন ক্ষতি করি নাই তবে আমি কেন?

খিলখিল করে হেসে উঠল ডাইনি। কি ভয়ানক সেই শুকনো হাসি। রবিনের কানের পাশ বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম পড়েছে।–দূর হ হারামজাদা! তরুলতা উঠোনে শেষে একটা বিষবৃক্ষ পুঁতলি?

মর! মর!...

তরুলতা রবিনের স্বর্গীয়া ঠাকুমার নাম। এ নাম কানা ডাইনি জানল কি করে।–তরুলতা আমার সাগরবেলা ছিল।

রবিনের বিশ্বাস অবিশ্বাস চরমমূহূর্তে জ্ঞানহীন। “সাগরদি” ছেলেবেলার রবিন তাকে এই নামেই ডাকত।

দেখতে দেখতে ডাইনি হয়ে উঠল ভয়ংকরী। এক চোখে তার জলন্ত মশাল অন্য চোখে নিশার ক্ষত। মাথার জটপাকানো তার চুলগুলো বাতাসে কানের পাশে কুন্ডলী পাকাচ্ছে। তার অট্টহাস্যে কাঁপছে চারধার। সে এগিয়ে আসছে রবিনের দিকে। ভয়েতে রবিন চিৎকার করে ওঠে। ধানক্ষেতে পড়ে গিয়ে কাদাজলে লুটোপুটি খায়। সে দৌড়াতে পারে না। পড়ে যায়।

জ্ঞান ফিরতে দেখে সে বিছানায়।

॥পোখরাজ পাথরের আংটি॥

লক্ষ্মীঠাকরুণের কর্কট রোগ ধরা পড়ল। হরেন ডাক্তার শেষ সময় জানিয়ে দিলেন। এর আগে গ্রামে আর কোন বাড়িতে কর্কট রোগে কেউ মারা গেছেন বলে শোনা যায়নি। বিসুচিকায় অনেকেই গত হয়ছেন। জ্ঞাতি-কুটুম্ব বাড়ির চৌকাঠ ছাড়তে শুরু করল। বহু পাপে নাকি এসব রোগ-বালাই ঘটে। তাই যাবার আগে নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের ছাপ ছাড়তে লাগলেন। এ বড় ভয়ানক রোগ। বাড়িটা দোষে ভরে গেল বিনু। তোমার মায়ের একটা প্রায়শ্চিত্ত করো। গ্রামের একটা কল্যাণ-অকল্যাণ তো আছে।

বিনয় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেল গোনকবাড়ি। প্রায়শ্চিত্তের কি কি করতে হবে আচার্য মশাইয়ের কাছে জানা দরকার। আচার্য মশাই বলেন, তোমাদের বাড়িতে এমন দিন আসবে বিনু ভাবতে পারিনা। তবুও বিধি তো একটা দিতে হবে।

–মায়ের কেন এমন হলো।

–জন্মের দায় বিনু জন্মের দায়! গতজন্মের কিছু আছে। নইলে খুড়িমার মত মানুষের এ রোগ হয়। এখন বৌমা আর তুমি তোমারই ভরসা।

–আপনিও তবে;

–ঘরে ছেলেপুলে রয়েছে; তাছাড়া এবাড়িটার তো একটা মান আছে। সমাজচ্যুত বড় খারাপ। তুমি বরং এসো। পাঁজিতে দিন সময় দেখে কি করতে হবে জানিয়ে দেব। একটা কথা বিনু, প্রায়শ্চিত্তে যেন কোন খামতি রেখো না। মা আর ক'দিন!

খবর পেয়ে বিনুর দিদি এসেছে। বিনু বললে, মায়ের শেষ ক'টা দিন এখানেই থেকে যা। শ্যামাও একটা বল পাবে।

–মায়ের সেবা করি আমারও ইচ্ছে হয়। তুই তো জানিস তিনি কেমন ধারার লোক। মা কে সজ্ঞানে দেখে গেলাম, আর বউ রয়েছে, শাশুড়ির যত্নআত্তি সে তো বউ ই করে।

–ক'টা দিন অন্তত থেকে যান দিদি। চলে গেলে আর যে ফিরবে না। মায়ের কিছু করতে হবে না। মা আপনাদের দুজনকে দেখতে পাবে, মায়ের তাতেই শান্তি।

–খোটা দিছিস বউ। বলি বিনু আগে না আমি।একটা কথা বউ মায়ের বালাজোড়া আর পোখরাজের আংটিটা আমাকে দিস। মাকে চেয়েছিলাম। তোর বাপের বাড়ি থেকে ওইরকম একটা আংটি দিয়ছিল না।

চৈত্র মাস। বিদায়ী বছর তার শেষ উৎসব নিয়ে এসেছে। গাজন উৎসবে এ গ্রামে বাণেশ্বরের পুজো হয়। সকাল থেকে বাড়িতে বাড়িতে তার আয়োজন চলছে। ঠিক সেই সময় বিনুর মা লক্ষ্মীঠাকরুণের ঊর্দ্ধশ্বাস উঠলে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে যায়। কয়েকজন ছুটে আসল বটে তাতে শোরগোল কম পড়ল না। শোরগোলের কারণ ছিল, বছরকার দিনে এমন কি করে বিপদে কেউ ফেলে। সংসারে ছিষ্টির কাজ কিছু হলে হাঁড়ি ফেলতে হবে। কথায় আছে বিষে বিষে বিষক্ষয়। অন্যের দীর্ঘশ্বাসে লক্ষীঠাকরুণের প্রানবায়ু সেদিনের মতো বের হল না। আরো সাতদিন সংসারে রয়ে গেল।

মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে পৌঁছনোর সময় তুমুল ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে যারা এসেছিল এই বৃষ্টিতে কাঠ আনতে যেতে কেউ রাজি হল না। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিনয় যেতে চাইলে একজন বলেন, শ্মশানে মৃতদেহ একা রেখে যেতে নেই।

বিনয় বলে, আপনারা সবাই আছেন।

–তা আছি। কিন্তু আমারা তোমার পরিবারের নই। মৃতদেহ পরিবারের কাউকে আগলে রাখতে হয়। তোমার বাবাকে তো এখানেই এনেছিলে বিনু। মনে কর।

বিনয় একাই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাঠ নিয়ে আসে।

দাহ কাজ শেষ হলে সকলে বিনুকে খাবার কথা বলল। ঝড়বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ চা ছাড়া কিছুই খাওয়া হয়নি। সেই রাতে দোকান খুলিয়ে বেশি টাকা দিয়ে রান্না করিয়ে বিনু সকলকেই খাওয়ায়। সত্যি ভারী অদ্ভুত।

শ্রাদ্ধশান্তি কেটে গেছে। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় বিনুর দিদি মায়ের হাতের বালাজোড়া আর পোখরাজের আংটি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। একদিন রাতে শ্যামার ঘুম ভেঙ্গে যায়, দেখে, তার শাশুড়ি খাটের পাশে মশারীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভীষন স্পষ্ট। একেবারে মুখোমুখি। বলছেন, “বউমা তোমার ওই পোখরাজ পাথরের আংটিটা আমার আঙুলে পরিয়ে দাও। আমার মেয়ের নয়, আমি তোমার মেয়ে হয়ে আসবো।” শ্যামা তার শাশুড়ির আঙুলে নিজের পোখরাজের আংটি খুলে পড়িয়ে দেয়। আংটি নিয়ে অদ্ভুত ভাবে বিনুর মা ঘর থেকে উধাও হলে সে ভয় পেয়ে যায়। এতক্ষণ সে বুঝি তাতেই ছিল না। গোটা শরীর তার থরথর করে কাঁপতে থাকে। ঘেমে নেয়ে একাকার। বিনুকে বলতে গিয়ে দেখে সত্যি তার আঙ্গুলের পোখরাজের আংটি নেই।

এটা স্বপ্ন হতে পারে না। সারারাত চোখে ঘুম আসে না।

॥দুই শালিকের গল্প॥

আমাদের বাড়ির কাঁঠাল গাছটি ছাদের গা ঘেঁষে উঠেছে। বৈশাখের এক শ্রান্ত বিকেলে ছাদেতে পায়চারি করছি। দেখি, কাঁঠাল গাছে একটি পাখির বাসা। আগে কখনো বাসাটি নজরে আসেনি। বাসাটিতে দুটি শালিক পাখি রয়েছে। কালচে খয়রী রঙের পালক দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা। প্রকৃতিদেবী চোখ দুটিতে সুন্দর করে কাজল পরিয়ে তাদের সাজিয়েছেন। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে। হলুদ ঠোঁট দুখানা নাড়িয়ে চ্যাক্ চ্যাক্ করে কত না কথা তারা বলছে।

দিন কয়েকের ভেতর শালিক পাখি দুটির সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতা গড়ে উঠল। সকালে বেলায় তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমার দিনের সূচনা হত।এরপর শালিক পাখি দুটি চরাটের জন্য উড়ে যেত। বিকেলে ফিরে তারা আমাকে ডাক দিত। নানা রকম গল্প করত। কখনো সেই গল্পের খোরাক থাকতাম আমি। মনে মনে হাসতাম আর ভাবতাম, এই কাঁঠাল গাছটি যদি না থাকত তাহলে এদের চিনতাম না। হয়তো অন্য কোথাও বাসা বাঁধত, যেখানে তাদের গল্প শোনার কেউ থাকত না। কত যে মিষ্টি স্বভাবের শালিক পাখি দুটি, অথচ লোকে যে কেন বাচাল বলে বুঝি না।

সেদিন দেখি একটি শালিক পাখি বাসার রয়েছে। বললাম, আজ তুমি গেলে না?

সে ঠোঁট নামিয়ে বলল, না।

নিজের ডানা দিয়ে ঠোঁটখানি আড়াল করে সে পাশের ডালে উড়ে বসল। দেখি, বাসায় দুটি ডিম।

বললাম, তোমাকে আর শালিক বলে ডাকতে পারব না।

সে বলল, কেন?

বললাম, আমি নির্বোধ তাই।

সে হেসে বললে, কি নামে ডাকবে।

–শালকাই। তোমার নতুন নাম দিলাম।

খুশিতে গা দুলিয়ে শালকাই ডানা মেলল আকাশে। এরপর থেকে লক্ষ্য করতাম, শালিক দানা এনে কত সোহাগ করে খাইয়ে দিত আর শালকাই সারাদিন তার ডিমতে তা দিয়ে বসে থাকত বাসায়। এক আদর্শ সুখী পরিবার।

এক সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। ভেঙ্গে পড়ল কাঁঠাল গাছের ডাল। বুদ্ধি আর ক্ষমতার দোহাই দিয়ে নিজেকে ঘর বন্দি রেখে যতই শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করি না কেন প্রকৃতির হুঙ্কারের কাছে মানুষ অসহায় ছাড়া কিছুই নয়। বৃষ্টি চলল রাত অবধি। সকালে দেখি বাসাটি ভেঙ্গে পড়ে আছে। আর একটা ভাঙা ডালের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে আমার শালকাই। ডিম দুটি ভেঙ্গে জলেকাদায় কোথায় মিশে গেছে খুঁজে পাওয়া গেল না।এক অকৃত্রিম বেদনায় সমস্ত শরীর ঝিম ধরে গেল।

ছাদের কার্নিশে চুপ করে বসে রয়েছে শালিক পাখিটি। সারাটা সকাল একটা কথাও বলল না। তার বেদনায় প্রকৃতির ঝলমলে সকাল ভারাক্রান্ত। কখন কোথায় যে সে উড়ে গেছে নজরে এল না। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল।

তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো দিন। উষ্ণ দেশের বাসিন্দা আমরা শীত সহ্য হয় না। রোদেতে পিঠ দিয়ে বই পড়ছিলাম, দেখি দুটি শালিক পাখি এসে বসল ছাদেতে। তাদের দেখে বুকের ক্ষতটা ভরে উঠল। তারা ফিরে এসেছে। আবার নতুন করে বাসা বাঁধবে। গল্প শোনবে। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সেই ভাবনায় ইতি পড়ল। তারা উড়ে গেল।

আমের বোলে মধুর খোঁজে মৌমাছি এসেছে। এসেছে মধুমাস। বাসন্তীকার একটু পরশের জন্য কত না রুক্ষ দিন পার করতে হয়, কত না একাকী রাত জাগতে হয়।

জগাই এসে বললে, বাবু, একবার ছাদে আসুন। শালিক পাখিটা বাসা বাঁধছে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল। পূর্ব ঘটনা মনে পড়তে বললাম, ওটা অন্য শালিক পাখি। সেদিন যখন তাকে ধরে রাখতে পারি নাই কেনই বা ফিরবে। সে ফিরবেনা।

–এতদিন তাকে দেখেছি চিনতে পারব না।

ছুটলাম ছাদেতে। সত্যি। সাথীহারা শালিক পাখিটা নতুন সাথী পেয়ে ফিরে এসেছে। নতুন উৎসাহে বাসা বাঁধছে।

॥গয়াখুড়ি ও পান্তাভাত॥

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বর্ষার সেই আগের দাপট আর নেই। অন্ততঃ এবছর তা ঘটেনি। পুকুরে নাইতে এসে গয়াখুড়ি জানতে পারে তার ছেলের বউ নয়ান সেকরার কাছে কানপাশা বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছে। দুই পা পিছিয়ে নিয়ে পুকুরের জল মাথায় ছিটিয়ে বিধবা আত্মস্বরে বলে, পাপ নিয়োনি মা, পাপ নিয়োনি।

বাড়িতে এসে গয়াখুড়ি ঝাঁঝিয়ে উঠল, বউ তোর কানপাশা কোথায়?

–আছে।

–কোথায়?

–আছে।

–খুব চোপা হয়েছে। মিছে কতা কইতে লজ্জা করে না।

–আপনি জানতে চাইলেন তাই বললাম।

–বটে, টাকাগুলো কোথায়?

–খরচ করেছি।

–এ্যাঁ! অতগুলো টাকা; হারামজাদী! টাকা কি তোর বাপের ঘর থেকে এনেছিলি।.....ও কি উওর না করে চললি যে বড়। বউ!

সেদিন বিকেলের গাড়িতে বিনু এসেছে। গয়াখুড়ি বিনুর বাবার ভিক্ষে মা। কায়স্থ ঘরের বউ গয়াখুড়ি পৈতেকালে ব্রহ্মচারীর মুখ দেখে ভিক্ষা দিয়ে বিনুর বাবার ভিক্ষে মা হয়েছিল। সেসব অনেক দিনের কথা। বিনুর তখন কতই বা বয়স চৌদ্দ-পনেরো, মা বাবাকে হারাল। কাকা-কাকিমা আছেন বটে, তাদের কাছে বিনুর কদর নেই। গয়াখুড়ির ছেলের বউকে বিনু নতুন কাকিমা ডাকে। বিনুকে পেয়ে নতুন কাকিমা তার বুকের শূন্যতাকে ভুলেছেন। তার যে নিজের কোন সন্তান নেই। লিলুয়ার ওদিকে কোন একটা কারখানায় কাজ করে সে। একটা ঘর দেখেছে বিনু। তার সেলামিতে কিছু টাকা লাগবে। গতবার সে যখন এসেছিল, নতুন কাকিমার কাছে টাকার কথা বলেছিল।

–বউ তোদের জ্বালায় কি দুচোখের পাতা এক করতে পারব না। মাঝরেতে ড্যাবড্যাবিয়ে তারা গুনব।

–রাত কি গো ঠাকুমা সবে তো আটটা বাজে। তুমি শুয়ে পড়েছ তাই মনে হচ্ছে।

–তুই থাম দিকিনি ছোরা।

–মা, বিনু বাইরে থাকে তাড়াতাড়ি খেতে পারে না। আপনি শুয়ে পড়ুন আমরা আস্তে কথা বলছি।

–চোখ যদি বুজতে পারতাম সর্বস্ব খেয়ে চেয়ে থাকি।

রাত ক'টা জানি না। পাশের ঘরে বিনু ঘুমিয়ে পড়েছে। "ছেলেটাকে অমন করে মায়ায় জড়াস নি বউ। গায়ে বামুনের রক্ত বইছে, একটা উঁচনিচ হয়ে গেলে নরকেও ঠাঁই পাবি না।"

–মা!

–মা হয়ে তাকে ধরে রাখতে পারলাম কই। তুই ছাড়া আর কার কাছে বলব;

–আমার বড় ভয় করে মা!

–ভয় কিসের। যেতে তো হবেই। বড় শ্রান্তি লাগে রে, বড় শ্রান্তি।

আষাঢ়ের মেঘ সারাদিন গুমরে গুমরে থেকে রাতে অঝরে ঝরে খাল-বিল-ডোবা এক করে দেয়। এই গ্রাম্য কুটিরের ভেতর রোজ তেমনি ঘটে। কালো আঁধারের বুক চিঁরে বেড়িয়ে আসে এক সন্তান হারা বৃদ্ধ মায়ের কান্না আর এক নিঃসন্তান বিধবা পুত্রবধূর বুকফাটা আর্তনাদ।

চৌদীঘি গ্রামে শেষ নাগপঞ্চমী পুজোর দিন প্রতিটি ব্রাহ্মণ ঘরে অরন্ধন। ফলাহার চলে। আর কায়স্থরা আগের দিন রেঁধে রাখা ভাতে জল দিয়ে পান্তা করে। নটেশাকের চচ্চরি, চুনোমাছের ঝাল আর পোস্তর বড়া ভেজে ব্রাহ্মণদের রাতের বেলায় খাবার আমন্ত্রণ করে। ফি বছরের মতো এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গয়াখুড়ির বাড়িতে নবারুণ ভট্টাচার্যের পাত পড়েছে। তিনি বিনুর কাকা। ভট্টাচার্য মশাই বলেন, ছেলেটার একটা সংসার করতে হবে। পেভাত মাস্টারকে তার মেজ মেয়ের কথা বলেছি। আমি আর ক'দিন। শেষে যদি জাত খোয়ায়। আপনি খুড়িমা আছেন, তবে কিনা বামুনের ঘর, কায়েত ঘর থেকে তো সব কাজ হয় না। তাছাড়া, বিনু যখন একটা কাজকম্ম করছে।

এতক্ষণ বিনু চুপ ছিল। নতুন কাকিমা তাকে চুপ থাকেতে বলেছে। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে কাকিমা বিনুকে বলে, একটা কথা দিবি বিনু, এই পান্তাভাতে কখনো যেন জল ঢালিস না।

॥বাজবাহাদূর ও রূপমতী॥

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতিহাসের আকর গহ্বর থেকে যে সম্পদ উঠে আসে তার আভূষণে জীবনের যে রূপ ফুটে ওঠে, সেখানেই তার প্রাপ্তি। হোক সে বিজাতি, হোক সে ভিন্ন তবুও ইতিহাসে সে একলব্য।

আমার গন্তব্য মধ্যভারতের পাহাড় ঘেরা অঞ্চল মালওয়ার। প্রাচীন ভারতে যে ষোলোটি মহাজনপদের নাম পাওয়া যায় মল্ল অর্থাৎ মালব তাদের একটি। মহাজনপদের সুবাদে অবন্তী, মৌর্য, গুপ্ত, সুলতান, মুঘল ইতিহাসের বিভিন্ন রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেছে। এমনকি বৃটিশরাও শাসন করেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর মালব, মালওয়ার নামে পরিচিতি লাভ করে। সীমানার সেই উত্থান পতনের বাইরে আজকের মালওয়ার তার নিজস্ব সংস্কৃতি আর বিন্ধ্য পর্বত ঘেরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যে পর্যটকের মন আকর্ষণ করে চলেছে।

মালওয়ারের প্রথম আকর্ষণ মাণ্ডুর জাহাজমহল। সুলতানী শাসক গিয়াসুদ্দিন খলজির নির্মিত এক অপূর্ব নিদর্শন। তবে আমার গন্তব্য মা নর্মদার তীরে রেওয়াকুণ্ড। এক পাঠান সুলতান প্রেমিক তার হিন্দু প্রেমিকার জন্য মা নর্মদাকে এক বিশেষ প্রনালীর দ্বারা এই কুণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সুলতান বাজবাহাদূর আর রানী রূপমতীর অমর প্রেমগাথা। পনেরশো শতকের সেই বিয়োগান্তিক কাহিনী আজও মালওয়ারের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে।

আমার পথপ্রদর্শক সুরজলালের জবানিতে যা সমগ্র মালওয়ারের কাছে এক অন্য পরিচিতি। ভারতে তখন মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল। মালবের সারঙ্গগড়ের জায়গীরদার ছিলেন সুজাত খান। তার মৃত্যুর পর তার রাজ্যকে তার তিন ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়। দৌলত খান, বায়েজীদ খান আর মোস্তফা খান। দ্বিতীয় ভাই বায়েজীদ খান বড়ভাইকে পরাজিত ও নিহত করে এবং মোস্তফা খান কে নিজের অধীনে আনেন। এই বায়েজীদ খান বাজবাহাদূর উপাধি নিয়ে সারঙ্গপুরের জায়গীরদার হন।

প্রকৃতিগতভাবে বাজবাহাদূর মানুষটি অন্যজগতের। ধমনীতে বইছে সুলতানী রক্ত অথচ সুলতান হয়ে তিনি ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে অকল্পনীয় দক্ষতা অর্জন করেন। শুধু তাই নয় ভারতীয় উপমহাদেশে কোন সুলতান বা বাদশা নৃত্য করতেন এমন কথা ইতিহাসে জানা যায় না। বাজবাহাদূর ছাড়া এমন সাক্ষ্য আর নেই। এখানেই শেষ নয় তার দরবার জুড়ে বসত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমালাপের আসর। সেই আসরে পায়ে ঘুঙুর পরে তিনি নৃত্য পরিবেশন করতেন। তিনি সাজতেন কৃষ্ণ। সত্যই বিধাতার নিয়ম বড়ই বিচিত্র। এক পরাক্রমশালী পাঠান সুলতান হিন্দু উপাখ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

মালবের ধরমপুর দুর্গের অধিকারী থানসিং রাঠোরের কন্যা ছিলেন রূপমতী। তিনি বিবাহিতা ছিলেন। চান্দেরীর বুন্দেলা রাজপুতের সঙ্গে তার বাল্যবিবাহ হয়। কিন্তু রাজপুত ঘরের পাথুরে কাঠামো রূপমতীকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি ফিরে এসেছিলেন মা নর্মদার তীরে। জনমুখে তিনি ছিলেন মা নর্মদার আশীর্বাদ প্রাপ্তা।

একদিন বাজবাদূর জঙ্গলে শিকারে চলেছেন। নর্মদার তীরে আসতে তিনি এক অপূর্ব নারী কণ্ঠ সঙ্গীত শুনতে পান। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত পায়ে সেই স্বরকে অনুসরণ করতে থাকেন। তার পিছনে তার সৈনিকগন। তিনি দেখেন এক অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী সখিদের মাঝে গান করছেন। সেই সঙ্গীত নর্মদার স্রোতে ধ্বনিত হয়ে তার কান স্পর্শ করে হৃদয়ে প্রবেশ করছে। বাজবাহাদূর প্রথম দর্শনে সেই অপরিচিতার সঙ্গীত

মোহে পড়লেন। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি নারী প্রসঙ্গে একটি কথা জেনেছেন–রূপেন লক্ষী গুনেন সরস্বতী। আদেশ দিলেন, এই নারীর পরিচয় জানা হোক।

বন্ধু মীর্জা বলেন, পরিচয়ের কি দরকার সুলতান, জঙ্গল পথে অশ্বপিঠে তুলে আনার হুকুম দিন।

–মীর্জা!.....তোমার কেন মনে হয় সুন্দরী নারী মানেই ভোগ্য। আমার আচরণে আগে কি কখনো এরকম লক্ষণ পেয়েছ?

সুলতানের আদেশে সৈনিকরা বেড়িয়ে পড়ল। বাজবাহাদূর তাঁবুতে ফিরে যান। মীর্জা দেখেন, এই কিছু সময়ের মধ্যে সুলতান কতটা বিচলিত। মীর্জা খুঁজে পান না এই বিচলিতের কারন।

দূত খবর নিয়ে আসে। স্ত্রীলোকটি হলেন ধরমপুর দুর্গের থানসিং রাঠোরের কন্যা রূপমতী। তিনি কাব্যে ও সঙ্গীতে পারদর্শীনি। সঙ্গীতজ্ঞ শেখ ওমরের কাছে এই রূপমতী সঙ্গীত চর্চা করেন।

–দূত, এক্ষুনি শেখ ওমরকে তলব দাও।

শেখ ওমর মালবের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুলতানের বন্ধু হন। তার আঙিনায় প্রেমিক বাজবাহাদূর রূপমতীর দেখা পেলেন। রূপমতী জানতে পারেন বাজবাহাদূর সারঙ্গগড়ের জায়গীরদার এবং একজন সঙ্গীতজ্ঞ। এরপর থেকে মা নর্মদার তীরে প্রতিদিনের রেওয়াজে রূপমতী আর বাজবাহাদূর মিলতে থাকেন। বাজবাহাদূরের নম্র ব্যবহারে রূপমতী তার প্রেমে পড়লেন। সময় নষ্ট না করে বাজবাহাদূর তার মনের কথা জানিয়ে বিবাহ প্রস্তাব দিলেন। রূপমতী বলেন, আমি বিবাহিতা।

–জানি।

–আপনি জানেন। কিভাবে?

–আমি তোমার গুণমুগ্ধ।

–সুলতান!

–তোমার প্রতি আমার এই প্রেম আমার আত্মার। কায়ের নয়।

–আজ আসি সুলতান।

–রূপমতী।

–কাল প্রভাতে এই মা নমার্মদার তীরে আপনাকে আমার কথা জানাব।

পরদিন প্রভাতে এক যোগিনী বেশে রূপমতী মা নর্মদা দর্শনে আসলে বাজবাহাদূর এই সাজের কারণ জানতে চাইলে রূপমতী বলেন, আমাকে বিবাহ করতে হলে আমার একটা শর্ত আছে।

–শর্ত। কি শর্ত?

–আমি প্রত্যহ মা নর্মদা দর্শন করি। রাজমহলে থাকলে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব। আপনি এমন কিছু করুন যে রাজমহলে থেকেও প্রত্যহ মাতৃ দর্শন করতে পারি।

–বেশ। কিন্তু এই যোগীবেশ কেন?

–আপনার অসাধ্য কিছু নেই। আমার যোগিনী বেশ আপনার কার্য সমাপ্তি পর্যন্ত আপনাকে শক্তি দেবে।

বাজবাহাদূর খোঁজ নিয়ে দেখেন নর্মদা তীরের অদূরেই এক মিষ্ট সরোবর রয়েছে। নাম রেওয়াকুণ্ড। সুলতান এক বিশেষ প্রনালীর দ্বারা মা নর্মদার জলকে রেওয়াকুণ্ডে নিয়ে আসেন। রেওয়াকুণ্ডের পাশে রানী রূপমতীর জন্য তৈরী করেন পটমণ্ডপ মহল। তার পাশে বাজবাহাদূর প্রাসাদ। শোনা যায় যে হিন্দু ও মুসলিম দুই রীতি অনুসারে তাদের বিবাহ হয়েছিল।

কথায় আছে, সর্বসুখ সহ্য হয় না। সীমান্ত থেকে দূরে রাজকার্য ছেড়ে রানী রূপমতীর গুণমুগ্ধ বাজবাহাদূর সঙ্গীতকে এক সুলতানের জীবন ভেবে ভুল করে বসেন। তার এই দুর্বলতার খবর শত্রু মারফৎ মুঘল দরবারে পৌঁছায়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে আদম খান মালব আক্রমণ করে। অতর্কিত আক্রমণে বাজবাহাদূর পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। আদম খান পটমণ্ডপ মহল ঘিরে ফেলে। জানতে পারেন রানী রূপমতী অসুস্থ। আদম খান সংবাদ পাঠান রানী সুস্থ হলে তাকে বাজবাহদূরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু শেষ পযর্ন্ত তা হল না। রানী রূপমতীকে পাবার জন্য আদম খান এক রাতে সেনা পাঠালেন। রানী রূপমতী আদম খানের দূর্গে যেতে রাজী হলেন। তবে তিনি একটি শর্ত দিলেন। আদম খানকে নিজে এসে তাকে নিয়ে যেতে হবে। দূতমুখে সব শুনে আদম খান তখন আপ্লুত। পটমণ্ডপ মহলে এসে আদম খান দেখেন রানী রূপমতী নিজেকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে বিষপান করেছেন।

রানীর আত্মহত্যার খবর শোনার পর বাজবাহাদূর খান্দেশ সুলতান মিরন মোবারকের কাছে সাহায্য চান। সুলতান মিরন তাকে সাহায্য করলেও বিশাল মুঘল সেনার কাছে পুনরায় বাজবাহাদূর পরাজিত হলেন এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। বন্দি বাজবাহাদূরকে আকবরের দরবারে নিয়ে আসলে আকবর রানী রূপমতীর প্রতি আদম খানের আসক্তির কথা জানতে পারেন। আকবর আদম খান কে পদচ্যুত করেন। মুঘল সেনাবাহিনীতে বাজবাহাদূরকে নিযুক্ত করলেও বাজবাহাদূর সম্রাটের অনুমতি নিয়ে নর্মদার তীরে ফিরে আসেন। রানী রূপমতীর সঙ্গীতই তার শেষ জীবনের সাধনা ছিল।

তথ্য: roarmedia–মাণ্ডুর প্রেমকথা।

॥চিঠি॥

বুড়শা, নামটি যাই হোক না কেন গ্রামটি বড় সুন্দর। নয় নয় করে কোলকাতা থেকে দূরত্ব তা আধবেলার পথ বটে। অংশুমাল যখন পৌঁছালো দিনদেব ক্লান্ত। বুড়শা ডাকঘরের নতুন পোষ্টমাষ্টার অংশু।

অতীতে জমিদার শশাঙ্ক সেনের কাছারি ছিল এটি। ভেতরের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও বাইরের থেকে দেখলে কোন ভূতুরে বাড়ি বলে বসলে ভুল বলা হবে না। আগের পোষ্টমাষ্টার রাধাকান্তবাবু এই ডাকঘরের একদিকে তার চৌকি খানি বিছিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গাঁ-গঞ্জের ছা পোষা মানুষ। অংশু তা পারল না। সে শহুরে জলহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। তাই যখন রাধাকান্তবাবু বলেন, আপনি কোলকাতা থেকে আসছেন জানলে মা কালীর একখানি পট আনিয়ে নিতাম। একথা শোনার পর নিজের প্রতি অংশুর অসহায়তা দশগুণ বেড়ে যায় তা হলফ করে বলতে পারি। তার পছন্দ অপছন্দর তালিকাটি স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র চাকরির পদটি সাবেকি।

গোপালবাবু এই পোষ্টঅফিসের পিয়ন। অংশু একটা বাড়ি ভাড়া দেখার কথা বললে, গোপালবাবু বলেন, এখানে ভাড়া বাড়ির চল নেই। আসলে বাইরে থেকে তেমন কেউ আসেন না, তাই।

–আমি তো এলাম।

গোপালবাবু মুখ নামিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, আমার বাড়িতে থাকবেন। যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

BANGLADARSHAN.COM

–অসুবিধা, কিসের? বরং আমি একটা অচেনা জায়গার safe থাকব।

–না, মানে আমি জাতে কায়েত, আপনি ব্রাহ্মণ।

হো হো করে হেসে ওঠে অংশু। আপনি এসব মানেন?

–মানবো না বলি কি করে; গাঁ-গঞ্জে বাস। যেখানে যেমন;

–আমরা সেই সেখানেই থেকে গেলাম। এগিয়ে যেতে পারলাম না। আমি আপনার বাড়িতে থাকব। আমার দুটো উপকার আপনাকে করতে হবে–একজন রাধুনি আর একটা চাকর। ছেলেটা সারাদিন আমার সঙ্গে থাকবে।

–আমি খোঁজ নিচ্ছি।

সে রাতে অংশুমান গোপালবাবুর অতিথি হন।

এখনো অবধি গ্রামে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটেনি। একটা লাল শালু কাপড়ের ঝালর দেওয়া তালপাতার বড় টানা পাখা তাই প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে স্বমহিমায় তার পুরাকালের কীর্তিকে বয়ে চলেছে। ডাকঘরের এক কোনে বসে এক গ্রাম্য বিধবা এই পাখার দড়িতে টান দিচ্ছে। ঘোমটায় তার মুখ অবধি দেখা যায় না। তবুও এই ফুরফুরে বাতাসের প্রানের ছোঁয়ায় মৈনাক পর্বতের শীতল সমীরন পযর্ন্ত হার মানে।

কেওনের মা, এই নামেই পরিচিত; এই পোষ্ট অফিসে পাখা টানার কাজ করে। আগে কেওনের বাপ পোষ্ট অফিসের রানার ছিল। এক ঝড়জলের রাতে ডাক নিয়ে যাবার সময় গাছ চাপা পড়ে মারা যায়। তারপর

থেকে সরকারি র্নিদেশে কেওনের মা এই পাখা টানার কাজ করে। মাষ্টারবাবুর লোকের দরকার, জানতে পেরে পাখার দড়িটা দেওয়ালের হুকে বেঁধে গোপালবাবুর কাছে গিয়ে বলে, আমার কেওনরে মাষ্টারবাবুর কাজে লাগিয়ে দাও না কেনে।

–কেওন। না, ও পারবে না। কেওন নেশা করে, স্যার জানলে রাখবে না।

–ছেলেটা অমন লয় গো। জোয়ান মরদ কাজকাম পায় না, আবনি তো সবকিছুই জানেন।

–সারাদিন স্যারের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। স্যার যা যা বলবেন ঠিক সেই মত কাজ করতে হবে।

–উ লিয়ে ভাববেন না। উ কেওন রে সব শিকিয়ে পড়িয়ে দেব ‘খন।

–বেশ।

কপালে দুহাত ঠেকিয়ে কেওনের মা বলে, মা মনসা দু টাকার বাতাসা চড়াব। কেওন রে একটুখানি মতি দিস মা।

“বাবু আসব!”–

–কে তুমি?

–কেওন। গোপাল খুড়ো পাঠালে।

BANGLADARSHAN.COM

পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি। খালি গায়ের ওপর গামছাটা উওরীয়র মতন জড়ানো। গায়ের রঙ আবলুস কাঠের সমান। শরীরের গঠন কঠোর পুরুষালী। মাথার চুলগুলো তেল দিয়ে আঁচড়ানো। বয়স পঁচিশের বেশি নয়। মুখের ওপর একটা গ্রাম্যভাব স্পষ্ট।

–কি নাম বললি?

–আজ্ঞে কেওন।

–বেশ নাম তো।

–ওই যে বোশেখ মাসে কেওনের দিনে হয়েছি।

কীর্তনের উৎস কথা শুনে অংশু মনে মনে একটু হাসল। তারপর বলল, কি কি কাজ পারিস?

প্রথমে সে ঘাড় কাৎ করল তারপর বললে, আবনি যা বলবেন।

–শুনেছি তুই নেশা করিস। আমার কাছে ওসব চলবে না। পারবি তো?

কেওন পুনরায় ঘাড় কাৎ করল। অনেকটা স্বর্গোক্তি হলেও কেওনের সামনে অংশু বলে, গোপালবাবু একজন রান্না করার জন্য কাউকে বলেছেন, তিনি কই এলেন না তো।

–দিঠাকরুন।
–উনাকে চিনিস?

–ডেকে আনবো, তবে বাবু দিঠাকরুন বড় মুখরা।

–তোর কি মনে হচ্ছে আমি ওনার সঙ্গে ঝগড়া করব।

কেওন লজ্জা পেয়ে গায়েতে জড়ানো গামছার খুঁট দাঁতে কাটতে থাকে।

সারাদিন কেওন অংশুর সঙ্গে থাকে। পোষ্টঅফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যে নাগাদ অংশু ছুটি দেয়। দিঠাকরুণ এসে রাতের রান্না করে দিয়ে যায়। হারিকেনের লালচে আলোয় অংশু বই খুলে বসে। এক একদিন পড়তে পড়তে অংশু ঘুমিয়ে পড়ে। রাতের খাবার ঢাকা পড়ে থাকে। সকালে কেওন সেগুলো খেয়ে নেয়।

"নেমে আয় টিয়া। উনি এক্ষুণি এসে পরবেন। তোর মামা জানতে পারলে বড় রাগারাগি করবে।"– পোষ্টঅফিস ফেরত অংশু গোপালবাবুর স্ত্রীর মুখোমুখি হয়।

দোতলায় ওঠার সময় অংশু এক অপরিচিতাকে দেখে। কেওন কে বলে, কে মেয়েটি।

–গোপালখুড়োর ভাগ্নী। আজই এয়েচে।

কেওন নিচে জল আনতে এসেছিল। বললে, খুড়িমা খুব বকাবকি করছে।

–কেন?

–আবনি ছিলেন না, ছাদে এয়েছিল।

অংশুর নিজকে বড় ছোট মনে হল। গোপালবাবুকে ডেকে বলে, আপনারা ছাদ ব্যবহার করেন না কেন। আমি আসার আগে আপনারা ছাদে উঠতেন। গোপালবাবু কেওনের মুখপানে তাকিয়ে বুঝতে পারেন। পরদিন সকালে দরজা খুলতে একটা বনমল্লিকা পড়ে থাকতে দেখে অংশু আশ্চর্য হয়। এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। তাছাড়া গোপালবাবুর বাড়িতে কোন বনমল্লিকা গাছ নেই। কে রাখল?–অংশুর বোধের দ্বারে কড়া নাড়াল টিয়ার পদধ্বনি। সিঁড়িতে সে লুকিয়ে ছিল। ফুলটা ঘরে তুলে রাখল অংশু।

ক'দিন একটু বেশি শীত পড়েছে। কেওন এসে মেঝেতে বসে। অংশুর খারাপ লাগে। বিছানায় বসতে বললে সে বসে না। গোপালবাবুকে একটা বেতের মোড়ার কথা বললে গোপালবাবুর স্ত্রী ঘরেতে মোড়া না থাকায় একটা জলচৌকি টিয়াকে দিয়ে ওপরে পাঠান। দিঠাকরুন রান্না করছিলেন। ঠাট্টা করে বলেন, কি লো টিয়া সুন্দরী ঘর পাততে এলি বুঝি। তা তোর বরটি বেশ। রাজপুত্তুর।

টিয়া লজ্জা পেয়ে যায়। জানলা দিয়ে সে অংশুকে ছাদেতে পায়চারি করতে দেখে।

ফাগুন মাস। বাতাসে পলাশ তার আগুন ছড়িয়েছে। বসন্ত এসেছে। আজ রবিবার। অংশুর দোলের ছুটিতে কোলকাতা ফেরার কথা ছিল। সে যায় নি। দুপুরে ভাতঘুম সবেমাএ চোখের পাতা ছুঁয়েছে একটা গুঞ্জনে ঘুম ভাঙল। বাড়ি যাবে বলে সে কেওনকে ছুটি দিয়েছে। ভরদুপুরে টিয়া তার মামাতো বোন বামার সঙ্গে ছাদেতে এক্কা দোক্কা খেলছে। বামা গোপালবাবুর ছোট মেয়ে। এক বন্য চঞ্চলা হরিনীর মতো টিয়া ছাদজুড়ে লাফালাফি করছে। টিয়ার এই চঞ্চলা স্বভাবে অংশু পরিচিত। মাথার ওপর একটা এরোপ্লেন উড়ে যায়। টিয়া ও যেন তার সাথে সেই অচিন দেশে যেতে চায়। টিয়া রঙের শাড়িতে আজ তার টিয়া নাম মিলেমিশে একাকার। জোড়া ভ্রুর নিচে পাতলা নাক। তাতে নোলক দুলছে। চিকন চিবুক। চোখের দেখা থেকে মনের মাঝখানে কখন টিয়া বাসা বাঁধে বোঝা যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎই খবর আসে গোপালবাবুর বড় জামাই অসুস্থ। সস্ত্রীক তিনি মেয়ের বাড়ি রওনা দেন। অংশু ডাকঘর থেকে ফিরলে জানতে পারে বাড়িতে বামা আর টিয়া রয়েছে। একটা বাটিতে মুড়ি নারকোল আর চা নিয়ে টিয়া এসে বলে, আজ দিঠাকরুন আসবেন না। আপনি আমাদের কাছে খাবেন। মামিমা বলে গেছেন।

–তোমার মামা কখন ফিরবেন।

–কিছু বলেন নি।

–তোমারা একা থাকতে পারবে।

–পারব। তাছাড়া আপনি আছেন।

এত জটিল প্রশ্নের কত সহজ উওর টিয়া কি করে দিল অংশুকে ভাবিয়ে রাখলে। টিয়ার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে কেওনের উপস্থিতি অংশুকে বিব্রত করল।

নকশাকাটা একটা আসনে অংশুকে বসতে দিল টিয়া। কাঁসার গেলাসে জল কাঁসার থালার গরম লুচি বেগুন ভাজা, বাটিতে ছোলার ডাল নারকেল নাড়ু সাজিয়ে পরিবেশন করে। অংশু হাত গুটিয়ে থাকলে সে বলে, খাওয়া শুরু করুন।

অংশু খেতে শুরু করলে টিয়া পাখার বাতাস করে। অংশু বলে, বামা কোথায়।

–ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন লাফালাফি করে।

BANGLADARSHAN.COM

–তুমি দুপুরে বিশ্রাম নাও?

টিয়া লজ্জা পেয়ে পাখার বাতাস করা বন্ধ করে। হারিকেনের আলো সেই লজ্জাকে আরো খানিকটা রাঙিয়ে দেয়।

আকাশে মেঘ জমেছিল। বৃষ্টি নামল। বৃষ্টিকে ছোবে বলে টিয়া হাত বাড়ায়। অংশু বলে, তুমি বৃষ্টি ভালবাসো।

টিয়ার চোখের ভাষা সেই উওরে বলে, ভালোবাসি, ভালোবাসি। বৃষ্টি আমার প্রানের দোসর।

–তুমি ভিজবে।

অপলক চোখে টিয়া অংশুকে দেখে। বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা তার গোপন কথাটি অংশু জানল কি করে। অংশু নিজের হাতটা টিয়ার দিকে বাড়িয়ে বলে, এসো। ভয় নেই, কাউকে বলব না। তোমার মামাকেও না।

বৃষ্টির দামাল ফোঁটায় টিয়ার সর্বাঙ্গ উঠল নেচে। সেই খুশির জোয়ারে অংশু নিজকে হারিয়ে ফেলল। বৃষ্টিভেজা বসন্তের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল দুটি প্রাণে, দুটি মনে।

এই ক'টা দিন অংশু প্রানভরে টিয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছ। গোপালবাবুরা ফিরে এলে অংশু কোলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে। সেদিন টিয়াকে সে বলেছিল মায়ের অনুমতি সে নিয়ে আসবে। বলে, কোলকাতা থেকে ফেরার সময় তোমার জন্য কি আনব।

–কিছু না।

–কোন কিছু না।

–একটা চিঠি লিখো। চিঠির ওপর আমার নাম লেখা থাকবে।

সেদিন রাতে অংশুর জ্বর আসে। অসুস্থ শরীরে সে কোলকাতা রওনা দেয়।

এরপর কেটে যায় একটা মাস। অংশুর জায়গায় নতুন পোষ্টমাষ্টার আসার খবর আসে। আর একটা চিঠি। গোপালবাবু দেখে টিয়ার নাম লেখা। চিঠিটা কোলকাতা থেকে এসেছে। তাতে লেখা আছে, টিয়া, তোমার অংশু গত দশদিন হল নিমুনিয়ায় মারা গেছে।.....

॥নিটখবর॥

অবশেষে সংবাদ প্রকাশের সময় এলো। তবে তার আগে তার একটি উৎস কাহিনী আছে।

সেবার দোলের মেলায় যার ওপর নজর পড়েছিল সে একটা ফুলদানি। বাহারী বলব না, তবে সুন্দর। কেয়া ফুলের আদলে তৈরী। সাদা রঙের সঙ্গে ঈষৎ সবুজের ছোঁয়া মেশানো মসৃন চকচকে তার গা। ভালো লাগায় দরদামে বিশেষ কার্পণ্য করিনি। কাঠগুদাম থেকে ড্রেসিং টেবিলটা আনার পর তার সাথে মানানসই একটা ফুলদানির কথা ভেবে রেখেছিলাম।

অফিস ফেরত ফুলের দোকানে গেলাম। থরে থরে বাহারী ফুল সাজানো। একডজন রজনীগন্ধ্যা নিলাম। চারপাশের চলন্ত শহরটা একটু একটু করে ক্লান্তির ঘুমে ঢলে, ড্রিমলাইটের আলোয় সে হয়ে উঠেছে মোহিনী। আকাশের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ সে রূপের লোভে জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। বইপড়া বন্ধ করে ঘুমোতে গেলাম। এক সুন্দর স্বপ্ন আঁকল সে আমার বন্ধ চোখের আড়ে।

সকালের মিঠে রোদ তার শরীরকে ছুঁয়ে প্রতিফলিত হয় চোখের ওপর। আমার আধভাঙা ঘুমচোখ। কি একটা মায়াবী নেশায় সে আমাকে বশ করে নিল। সন্ধ্যাবেলায় রজনীগন্ধ্যার সুবাসিত ঘ্রাণ জানলার পর্দা উড়িয়ে আসা দখিনা বাতাসে মিশে আমার তনুমনে যে পুলকের সঞ্চার করে সে পরশে আমার সমস্ত দিনের ক্লান্তির অবসান হয়।

রবিবার। সকাল থেকে আকাশটা মুখ নামিয়ে রয়েছে। কখনো রিমঝিম কখনো ঝরঝরে বাদল ঝরে চলেছে। জামাইবাবুর প্রোমোশনের খবরটা বাবা-মা কে জানাতে বড়দি এসেছে। একটা উপহার বাক্স হাতে ধরিয়ে বড়দি বলল, এটা তোর।

–কি এটা?

–খুলেই দ্যাখ! তোর জামাইবাবু নিজে পছন্দ করে এনেছে। তোর জামাইবাবু আসতে পারল না, বুঝিস-ই তো প্রোমোশন মানেই দায়িত্ব বেড়ে যায়। ভাই, ব্যবহার করবি। তুলে রাখবি না।

উপহারের জন্য জামাইবাবুকে ধন্যবাদ জানাব, না দিদিকে কিছু বলব, কোনটা করা উচিত হবে ভেবে না পেয়ে নিজের মুন্ডটিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে আর একবার বিপরীতে পরিবর্তন করে দিলাম। আর নিজকে বললাম, কষ্ট জামাইবাবু নয় আমি পাব; পাব কেন বলছি পেতে শুরু করেছি।

রাতে ভালো ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ ফিরছি আর ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিটাকে দেখছি। অবশেষে টেবিলের ওপরে রাখা উপহারের বাক্সটাকে তুলেই রাখলাম।

উচাটন মনে ক' দিন ফুলের দোকানে যাওয়া হয়নি। ফুলদানিটা ফুল শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। আঁচল দিয়ে তার গায়ের ধুলো মুছে মা বললে, কিছু ফুল এনে তো রাখতে পারিস। কি যে তোর হয় মাঝে মাঝে!

উত্তর করলাম না। শুধু একবার তাকে দেখলাম। নিজে পছন্দ করে আমি তাকে এনেছি। আগের মতো তার যত্ন করি না। সজীব হলে অনর্থ ঘটত সময় লাগত না। এ সাজা তার পাওনা ছিল না। চারদেওয়াল মাঝে সে বড়ো একাকী বোধ করছে।

পাশের বাড়ির জয়চন্দ্রের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাড়ির সকলের নিমন্ত্রণ রয়েছে। অফিস থেকে ফিরতে মা এসে বললে, “কিছু একটা কিনে আন।” ফেরার পথে ফুলের দোকানের ছেলেটা দেখতে পেয়ে বলে, ভালো রজনীগন্ধ্যা এসেছে দাদা নিয়ে যান।

হঠাৎই সমস্যা মুক্তির পথটা মাথায় আসতে "ইউরেকা"- বলে লাফিয়ে উঠলাম। টেবিলের ড্রয়ার খুলে পেয়ে গেলাম উপহারের সেই বাক্সটা।

মোড়ক সমেত সেভাবেই রাখা আছে। কাঠগুদাম থেকে ড্রেসিং টেবিলটা কিনে আনার সময় জামাইবাবু সঙ্গে ছিলেন। ড্রেসিং টেবিলের মানানসই ফুলদানির কথাটা তখনই উঠেছিল। পরে আমি নিজেই কথাটা বেমালুম ভুলে যাই। দোলের মেলা থেকে আমার কিনে আনা ফুলদানি আর জামাইবাবুর দেওয়া ফুলদানিটা হুবুহু এক। রঙে ঢঙে আদলে তারা এক ছাঁচে গড়া। মাতৃগর্ভে জন্ম নিলে হত যমজ।

জীবনে ভালোলাগা খারাপলাগা সবই আছে। তবুও একটুতেই আমরা অস্থির হয়ে উঠি। জয়কে ফুলের দোকানে দেখে এগিয়ে গেলাম। সে বললে, কাকিমার দেওয়া ফুলদানিটা আমার বউয়ের খুব পছন্দ হয়েছে।

ছেলেটা কে বললাম, এক ডজন রজনীগন্ধ্যা দে।

॥এক দুই তিন॥

॥এক–অতীত॥

ন্যাড়া মাথায় সদ্য চুল গছিয়েছে। পৈতে ধারনের পর বাবা আমাদেরকে, মা আর আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। গ্রামে নিকট আত্মীয় বলতে তেমন কেউ ছিল না। অনাত্মীয় যারা তারাই এতদিন পাশে ছিলেন। দোতলা বিরাট এই বাড়িতে সবাই ভাড়াটে। আমরা তাদের সতীর্থ হলাম। কলকাতায় অনেক কিছু আছে–উঁচু উঁচু বাড়ি, বড় বড় গাড়ি, কতলোকজন, সন্ধ্যে হলে রাস্তায় আলো জ্বলে, মানুষের হৈচৈ তে গ্রামের ফাঁকা মাঠের শূন্যতা অনুভূত হয় না, তবুও বুকটা ফাঁকা থেকেই যায়।

এখানে আসাবধি দেখে আসছি আমাদের পাশের ঘরটি তালাবন্দী। আমার চারদিনের অভিজ্ঞতা: এই বন্ধ ঘরের সামনে দিয়ে কেউ যাতায়াত করে না। সন্ধ্যে হলে ভুলেও কেউ দরজায় মাথার আলোটাকে জ্বেলে দেয় না। দৈনন্দিন জীবনে আসা-যাওয়ার পথে এই এই স্বল্পপরিসর জায়গাটিকে এড়িয়ে চলাটাই এই বাড়ির প্রত্যেকের রুটিন মাফিক কাজ। এই নিয়মের কোন ব্যাতিএম ঘটে না। দিবারাত্রি সে একলাটি আবস্থান করে।কতদিন ধরে তার এই একাকীত্ব চলে আসছে জানি না। সেদিন লাট্টু ঘুরিয়ে তার নির্জনতাকে বোধ করি আমই ভাঙলাম। আর সেই কাজে নিজেকে জয়ী ভেবে মনে মনে বাহবাও দিলাম।

রবিবার এখানে সবাই ঘরেতে থাকে। গ্রামে থাকার সময় বাবা রবিবার বাড়ি আসতেন। বাবার সাথে মুদির দোকানে গেলে দোকানী আমাদের পরিচয় জানতে চান। বাবা বাড়িওয়ালার নাম নিলে তিনি বলেন, বিচিএগুপ্তের খাতায় আর একটি নাম সংযোজন ঘটল। কানাইবাবু এতকিছুর হিসাব রাখেন কি করে। দোকানদারের কথা বাবার ভালো লাগেনি। কোন কিছু ভালো না লাগলে বাবার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

বন্ধ দরজায় বাইরে লাট্টু ঘোরালে খোকন বারন করত। বলত, এই ঘরে কারা যেন থাকে।
বললাম, কারা থাকে?

–তাদের কথা মুখে আনতে নেই।

পলেস্তরা খসা চুন ওঠা বাড়িটার পিছনে একটা বাঁশবন। জানলার পাল্লাগুলো সব খোলা যায় না। তার ওপরে জোর খাটাতে গেলে মনে হয় এই বুঝি তার বৃদ্ধ কলেবর হতে একখানি অঙ্গ খসে পড়ল। আর তাকে জোড়া লাগানো যাবে না।

সারাটাদিন নিজকে শান্ত রাখতে পারিনি। বার বার এসে তাকে দেখেছি। দুপুরে চারপাশ নিঝুম হলে তার কাছে গেলাম- কি আছে ভেতরে, কারা থাকে? দরজায় একটা ছোট ছিদ্রে চোখ রাখতে ভেতরে জমাট অন্ধকার। কি থাকতে পারে সেখানে, যার হিসাব জীবন রাখতে চায় না। সেই স্বল্পপরিসর স্থানে তাকে বন্দী করে রাখতে চায়। দরজার এই দুখানা কাঠের পাল্লা আলোর দুনিয়া থেকে তাকে আড়ালে রাখতে চাইছে।

॥দুই–ন্যাড়ামামা॥

বাবার এক মামা আন্দামানে চাকরি করতেন। নাম বিনোদভূষণ চট্টোপাধ্যায়। সেদিন রতনদা আমাদের পোস্টঅফিসের পিয়ন একটি চিঠি দিয়ে গেল। বাবা চিঠিটা পড়ে বলল, ন্যাড়ামামা আসছে।

এতদিন নামটা শুনেছি। তিনি অনেক কিছু পারেন। মজার মজার কথা বলেন। অনেক দেশ তার ঘোরা। তার কাছে না বলে কিছু নেই। প্রায়শই ন্যাড়ামামার কথা শুনতে শুনতে লোকটিকে না দেখলেও একটা কাল্পনিক চরিত্র তৈরী হয়ে গিয়েছে। ন্যাড়ামামার মাথায় চুল নেই, আকারে একটু খাটো। শরীরের মধ্যমনি ভুড়িটিও বেশ। হাঁটা চলার মধ্যে একটা অদ্ভুত ছন্দ আছে।

এক কথায় আমার মন তখন তোলপাড়। স্কুলে–বাড়িতে কোথাও মন নেই। বন্ধুদের বলে রেখেছি। এখন শুধু ক্যালেন্ডারের পাতায় দিন বদলের অপেক্ষা।

যেদিন তার আসার কথা তিনি আসলেন না। বাবা সেদিন অফিস ছুটি করে বাড়িতে ছিলেন। মা ন্যাড়ামামার পছন্দের রুইপোস্ত আর কচুর শাক রেঁধে ছিলেন। কিন্তু আমি, আমার সবকিছুই যে বৃথা গেল। বড়াই করে বন্ধুদের বলেছিলাম। চোখের কোন জুড়ে ঢেউ এর উথাল পাথাল। এক সময় তা গড়িয়ে পড়তে থাকল।

একদিন আবার চিঠি এল। তিনি লিখেছেন এবার তিনি আসবেনই।

কথায় আছে সময় সবকিছু ঠিক করে। ন্যাড়ামামার এবার ও না আসার দুঃখ কে আস্তে আস্তে কাজের মাঝে হারিয়ে দিল। কিন্তু ভাঙার একটা দাগ থেকে যায়। তাই মনে কোথাও ন্যাড়ামামা থেকেই গেল।

পেড়িয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। আমি তখন কলেজে পড়ি। সেদিন বাড়িতে ছিলাম। ভাদ্র মাসের খাঁ খাঁ দুপুরে একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছে ঠিক এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। দরজা খুলতে তিনি আমার বাবার নাম নিয়ে বলেন, এটা অমুকের বাড়ি।

আমার উওরের অপেক্ষা না করে তিনি একপ্রকার আমাকে সরিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।কি ঘটল বুঝে উঠতে না উঠতে শুনি ঘরের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ আসছে। হতভম্বের মতো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। কানে আসছে, মা ডাকছে, কে এসেছে দেখে যা। ন্যাড়ামামা।

লোকটি আদ্যোপান্ত সুটবুট পরা সাহেবী কায়দার।

॥তিন–যদিদং হৃদয়ং॥

“বাইরে থেকে তোমার কিছুই জানিনা, অন্তরে পেয়েছি বেদনা”–সূচীশিল্পে আঁকা রূপকথার গল্প দেওয়ালে ঝোলানো। মায়ের সাধ ছিল মেয়ে হলে সাজিয়ে-গুছিয়ে বড় কোন ঘরে পাঠিয়ে দিত। বিধাতা পুরুষ মায়ের স্বপ্নে জল ঢেলেছেন। কিন্তু জীবনের উপসর্গ মনের গতিকে অচল রাখা যায় না। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো থেকে থেকে সে বেজে ওঠে। ভেবে পাই না লাল-নীল শাপলা-শিমূল যাকে পায় বিবাহ নামক আটচালার মানিঅর্ডার গ্রাহক হিসাবে পাঠিয়ে দেয়। বড়ই কঠিন পরীক্ষা আমার। জীবনের বড় বড় পরীক্ষা উত্তীর্নকালে প্রজাপতি উড়ে তার পাখার বাতাস করে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। অগ্নিপরীক্ষায় নিজকে পোড়ানো যায়, কিন্তু মন সে যে চিরকালের অধরা। তাকে বশে আনতে গেলে সর্বত্যাগী হতে হবে। তার ওপরে বন্ধু বান্ধবদের রসবোধের চেয়ে তাদের কৌতূহল বড়ই প্রবল।

রাতে শুতে গেলাম। পরদিন ঠিকানা খুঁজতে যেতে হবে। মানুষের জীবনে কত আশা, কত স্বপ্ন, জীবনকে ঘিরে কত আয়োজন, কত আবেগ অথচ কিভাবে সেসব পরমায়ুহীন হয়ে ঝরে পড়ে তা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করে দেখিনি। অবশেষে এক বিবাহপোযোগী পাত্রের ঠিকানা খুঁজতে বের হলাম। আমার পরিচিত এক ভদ্রমহিলা তার মেয়ের জন্য একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। পাত্রের নাম ঠিকানা জানেন না। শুধুমাত্র খবরটির যথার্ততা যাচাই করার জন্য আমাকে নিয়োগ করেছেন। কারন পাত্রটি নাকি আমার এলাকাবাসী।

আলসেমি ছেড়ে বাবা মায়ের ধাক্কা ধাক্কিতে পরপোকারে নেমেছি। সমস্যাটা শুরু হল পয়লা নম্বর থেকেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন জানতে পারলাম সেই প্রাণের দোসর অদৃশ্যমান ব্যক্তিটি আর কেউ নয় স্বয়ং অনুসন্ধানকারী। বড়ই অদ্ভুত, বড়ই হাস্যকরে পরিনত করলাম নিজকে। জীবনের এহেন পরীক্ষা জীবদ্দশায় দ্বিতীয় জন করেছেন কিনা আমার জানা নেই।ডাইনে বাঁয়ে কত লোক চলেছে। তারা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর আমি নিজের।

কয়েকদিন পর ভদ্রমহিলা যিনি আমাকে এই গুরু ভার দিয়ে ছিলেন তিনি নিজেই তার হাত থেকে আমাকে মুক্ত করলেন। পাত্রী এখন বিয়ে করতে নারাজি।

উফ! মুক্তি।
ঠিক তখনই আমার কালের বাঁশিতে সুর বাজছে।

অফিস থেকে ফিরে দেখি টেবিলের ওপর রাখা একটি মেয়ের ছবি। চন্দননগর থেকে এসেছে।

ভোরে বিছানা ছাড়লাম। শহরটা তখনও ঘুমন্ত। পুবের আকাশ লাল। একটা দোয়েল পাখি শিষ দেয়। টেবিলের ওপর খোলা বইয়ের পাতা।

স্ত্রী আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার বিশ্বাস। আমার শূন্য রাতের আচ্ছাদন, প্রভাতের চঞ্চলতা। শীতের দিনের রোদ্দুর, বর্ষার স্নেহধারা। আমার পূর্বজের আশীর্বাদ, ভবিষ্যতের আধার।

॥মনোবিদ॥

“মাথাটাকি সত্যি সত্যি খারাপ করে ফেললে, আপন মনে কি সব বকে চলেছ অতীন।”....
বিশুদার কথায় সে বললে, জীবনের কাছে এটাই বোধহয় শেষ পাওনা ছিল আমার। সংসার পরিজন হারিয়ে ছিলাম, আজ যে নিজেকে হারাতে চলেছি।

–কাল ডাক্তারের সাথে তোমার appointment আছে তো।

–আমার ভয় করছে বিশুদা, যদি হারিয়ে যাই!

–নিজেকে হারিয়ে ফেলা সহজ নয়। নিজেকে শক্ত করতে শেখ। তাছাড়া এখানে আমরা সবাই তো রয়েছি।

মাঘ মাস। হু হু করে বাতাস বইছে। আকাশ জুড়ে কালো মেঘ করেছে। মেস থেকে বেড়িয়ে ষ্টেশন আসার সময় তাড়াতাড়িতে ছাতাটা নিতে ভুলেছে অতীন। টিকিট কেটে সে ডাউন গাড়ির সময়সূচী দেখে। সাতটা দশে ডাউন কাটোয়া লোকাল। শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল পশ্চিমীঝঞ্ঝার কারণে সন্ধ্যের দিকে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন লোক চোখে পড়ছিল, বৃষ্টি শুরু হতে আঁধারের কোন গুহায় আশ্রয় নিয়েছে জানা গেল না।

অতীন ঘড়ি দেখে ছ'টা ষোল। ষ্টেশন মাষ্টারের কেবিনের দরজাটি আধ ভেজানো। প্ল্যাটফর্ম চত্বরে সে একা। প্ল্যাটফর্মের লাল আলোর আভায় হাত পা গুলো তামাটে দেখাচ্ছে। চায়ের দোকানের ঝাপ বন্ধ। ধপ! - একটা আওয়াজ। চমকে ওঠেঅতীন। কোত্থকে একটা কালো হুলো বেড়াল তার সামনে লাফিয়ে পড়ল। জ্বলজ্বল চোখে বিড়ালটা অতীনের দিকে তাকিয়ে ডাকল-ম্যাও।

–একটু সরে বসবেন। ভয় পেলেন নাকি! অতীন সরে বসলে লোকটি তার ভেজা ছাতা বন্ধ করে অতীনের পাশে বসল। লম্বাটে গড়ন। গায়ের রঙ কালো। কাঁচাপাকা চুল। বাঁ গাল জুড়ে লম্বা কাটা দাগ।

ফ্ল্যাক্স থেকে চা বের করে অতীনের দিকে এগিয়ে বলেন, নিন চা খান।

অতীনের বিস্ময় ঘোর তখনো কাটেনি। সে ষ্টেশনে একাই বলতে ছিল। লোকটি কখন আসল। সে একবার ষ্টেশনমাষ্টরের কেবিনের দিকে তাকাল। কেবিনের দরজা বন্ধ। লোকটি বলেন, সাহেবরা দাওয়াইটা ভালই দিয়ে গেছেন। ও মশাই! চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ধরুন।

অতীন দীর্ঘশ্বাস ফেললে, লোকটি বলেন, এই মাঘের শীতে ঝড়বৃষ্টি গোদের ওপর বিষফোঁড়া মশাই।..... নিশ্চয়ই আমার কথা ভাবছেন। আর ভাবনাটা আসবে নাই বা কেন অন্ধকারময় জনমানবশূন্য এইরকম স্থানে আমার মতো একটা বিদঘুটে চেহারায় লোক অযাচিতভাবে ভাব জমালে চিন্তা তো আসবেই।

অতীন একটু হেসে চায়ে চুমুক দিল। বেঞ্চের পাশে সেই কালো বিড়ালটা নেই। অতীনকে চঞ্চল হতে দেখে লোকটি বলেন, কিছু খুঁজছেন।

অতীন বিস্ময়ে বলে উঠল, আপনি আমার মনের কথা কি করে জানতে পারছেন। একটু আগে চায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে চায়ের কথা ভাবতে আপনি এসে চা offer করলেন। এখন ওই বিড়ালটার কথা;

–বিড়াল!

–একটা কালো বেড়াল এখানে একটু আগে বসেছিল।

–আছে কোথাও এদিক ওদিকে।সবকিছুকে নজরবন্দি করা যায় কি অতীনবাবু? আপনি তো মনোবিদের কাছে যাচ্ছিলেন।

প্ল্যাটফর্মের লাল আলোটা একবার নিভে দপ্ করে জ্বলে উঠল। অতীনের গলা শুকিয়ে আসে। কানের গা বেয়ে একবিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ে। লোকটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। রুমাল এগিয়ে বলে, মনের আকাঙ্ক্ষা সবসময় পূর্ণ হয়। কেউ তা বুঝতে পারে কেউ পারে না। কোনটা বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে, না আপনাকে। মানুষের মনের কথা পড়াই আমার কাজ। মনোবিদের কাজ। অথচ আমাদের শরীরে মন বলে কিছু নেই।হার্টের পীড়াকে সবাই মন বলেভুল করে বসে। শরীরের সকল function কে control করে এই brain আর কিছু না।

–ওরা যে বলে....

–আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কোন মনোবিদের কাছে যাবার আপনার দরকার নেই। এটা আমার prescribed বলতে পারেন।

অতীনের অস্ফুট স্বর শোনা যায় না। চোখ তুলতে দেখে সেই কালো বেড়ালটা বেঞ্চের পাশে বসে।চারপাশটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

পরদিন খবরের কাগজে ছেপেছে ডাঃ অবিনাশ ধর গতকাল সন্ধ্যায় রুগী দেখতে যাবার পথে ঝড়বৃষ্টির সময় গাড়ি দুঘটনায় মারা গেছেন।

॥ঐক্যের জয়॥

পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। ছাত্রছাত্রী শূণ্য লাইব্রেরীটা টেবিলচেয়ারগুলোকে আস্ত খেতে আসছে। মাথার ওপর পাখার ব্লেড তিনটি বৈচিত্র্যহীনভাবে ঘ্যানঘ্যান করছে। ভর দুপুর। চেয়ারের হাতলে মাথাটা ঠেকাতে দুটো হাঁই উঠল। তন্দ্রালুভাব এক্কেবারে আসেনি স্বজ্ঞানে অস্বীকার করি কি করে। চোখটা একটু আলগা হতে দেখি শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর একটা তেঁতুলে বিছে তার কালো চকচকে শরীরটিকে নিয়ে পথভ্রষ্টের মতন এদিকে ওদিকে ঘুরে চলেছে। কখন এবং কোথা থেকে তার আগমন ঘটেছে সে ঘটনা বন্ধ চোখের আড়ে তখনই হারিয়ে গেছে। পৃষ্ঠদেশে, উত্তল অবতলে আঁকাবাঁকা বেনীর ছিপছিপে তণ্বীয় ন্যায় তার চলন। বইয়ের আলমারির নিচে দিয়ে টেবিলের তলায় কংক্রিটের থামের আড়ালে সে লুকোচুরি খেলছে।

লাইব্রেরীর শ্বেতমর্মর মেঝেটি উওর থেকে দক্ষিণে এক দীর্ঘ ফাটল রেখা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ভিন্ন সভ্যতার মতো একদিকে সারিসারি বইয়ের আলমারি অন্যদিকে রিডিং রুম। তেঁতুলে বিছেটার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়ে একটা বই খুব নজর কাড়ল। আকণ্ঠ পাঠ করে ঝিমিয়ে পড়ার আগে মহাসাগরের ওপার হতে লাল উর্দি সেনার কুচকাওয়াজ কানে এল। ওরে অনার্য, তোদের পুনরুত্থানের সময় এসেছে। শাণিত কর বাহুবল। কিছুকাল পর আকাশ পথে বাজবে দামামা, বজ্রনাদে কাঁপবে ধরাতল। আর পিছনে নয়। ভয়কে জয় করে ওড়াতে হবে বিজয় নিশান। আর পরাজিত হলে আমৃত্যু জ্বরাবাস। সুপ্রাচীনত্বের আকর বৈভব যা কিছু এতকাল চাপা পড়েছিল একদল লাল পিঁপড়ে মেঝের ফাটল পথ হতে বারিবারি তা তুলে আনছে।

রামায়ণের সীতা উদ্ধারকালের সেই ঘটনার কথা মনে পড়ল। কুম্ভকর্ণের পদভারে কিভাবে রামের বানর সেনা পদদলিত ও ছত্রভঙ্গ হয়েছিল ঠিক তেমনি তেঁতুলে বিছের আগমনে লাল পিঁপড়ের দল ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। দেখতে দেখতে দৃশ্যটাই বদলে গেল। ছোট বড় নানান আকারের অসংখ্য অগুনতি লাল পিঁপড়ে দলে দলে রক্ত স্রোতের মতো বেড়িয়ে আসতে থাকল। বীর অভিমন্যু তার পরাক্রমী বাহুবলে কুরুসেনার চক্রব্যূহ মাঝে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু সপ্তরথীর আক্রমণকে প্রতিহত করে বাইরে আসার ক্ষমতা হয়নি।

তেঁতুলে বিছেটি নিজেকে বাঁচাতে প্রথমে শত্রু মাঝে লম্বা ল্যাজের ঝাপটা দিল। তাতে বেশ কিছু লাল পিঁপড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু সহস্র রথীর সমবেত আক্রমণ তেঁতুলে বিছের ওপর একটা কৃত্রিম লাল পাথরের পাহাড় তৈরী হলে তার গুহার অন্দরে বিছেটির সমাধি ঘটল।

অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলাম। তার চেয়েও আশ্চর্য হলাম এই ভেবে, সামান্য এক তেঁতুলে বিছের কামড়ে এতবড় নরদেহ কাতর হয়ে পড়ে সেখানে তার পায়ের দাঁড়ার চেয়ে আকারে ছোট জীব শুধুমাত্র একতার জোরে তাদের অভিযানকে জয়যুক্ত করল। ঐক্যের জয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

॥জলছবি॥

বিকেলের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ জুড়ে। ক্যানভাসে তুলির টান দিতে সে বললে, ওই গাছ আর ফুল দেবে না রে। আমার একটা ছবি আঁক না।

দেখলাম তাকে। নয়-দশ হবে। পরনে আধময়লা ফ্রক। মাথায় না আঁচড়ানো ঝাকরা চুল। বেশ কথা বলে। বললে, ড্যাবড্যাবিয়ে কি দেখছিস। মেয়েছেলে দেখিস নাই।

–কি নাম তোর?

–সখি।

–বা! বেশ সুন্দর নাম তো।

–সুন্দর না হাতি।

–পড়াশোনা করিস।.....কি রে বললি না।

–না।

–সারাদিন কি করিস।

কথা শেষ হল না। সে ছুটল। ফুটপাতের ওপর তার সঙ্গীরা খেলছিল। ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হতে একটা বিয়ের গাড়ি এসে থামল। নববধূর পরনে লাল শাড়ি। মাথায় ফুলের মুকুট। জানলার কাঁচে তার চোখ। একবার সে ওই ন্যাড়া গাছটাকে দেখল। সিগন্যাল সবুজ হতে বিয়ের গাড়ি রাস্তা পার করে। পাশে একটা স্ট্যাচু। কার মূর্তি তার হয়তো জানা নেই। রঙ ওঠা হাতের চুরিগুলো সে নাড়াচাড়া করে। একটু আনমনা সে। সন্ধ্যের আলো আঁধারে বিয়ের গাড়ির ড্রাইভারের মতো মূর্তিটাকে দেখাচ্ছে। সে ভেংচি কাটে। গাড়ির কাঁচে মুখ দিতে ড্রাইভার বারন করছিল। হেডলাইটের আলোয় সখির দুচোখে জ্বলজ্বল করছে নববধূর সাজ।

একটা লোক আধখাওয়া খাবারের একটা প্যাকেট ছুড়ে ফেললে বাকি ছেলে মেয়েরা ছুটল।

সে এসে বললে, বাড়ি যাবি না। রাত হয়েছে। রাতে কারা সব আসে।.....বউটার মতো সুন্দর একটা ছবি এঁকে দিবি।

॥অরূপরতন॥

বর্ধমান চলেছি। লোকাল ট্রেন। অফিস টাইম। চুচূড়া ষ্টেশনে ট্রেন থামতে যাত্রীরা একেবারে হুড়মুড়িয়ে উঠতে শুরু করল। দুজন স্ত্রীলোক দুই বোঝা জালট নিয়ে উঠতে যাত্রীদের সঙ্গে বচসা লেগে যায়। কামরার ক্রিয়দংশে দক্ষযজ্ঞ লাগে আর কি। এরমধ্যে ভীড় ঠেলে একটি মেয়ে ভেতরে এল। আমরা মুখোমুখি। বছর বাইশের হবে। চুরিদারের ওড়না দিয়ে তার গোটা মুখ ঢাকা। তার চোখদুটি পর্দার বাইরে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। জ্যৈষ্ঠের গরমে লৌহশকটে বন্দী মানুষগুলোর গলদঘর্ম অবস্থা তখন এই অবগুণ্ঠন সত্যিই বিস্ময় লাগায়। খোলা মাঠের দমকা বাতাসে মেয়েটির অবগুণ্ঠন খুলে যায়। সাথে সাথে তার এলো চুল লুকিয়ে রাখা রূপকে আড়াল করে। প্রকৃতি যেন নিজেই চায় না সে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হোক। কিন্তু তার চোখ চুলের সে ভার বইতে নারাজি। তাকে সরাতেই হল।

বয়স রূপ অবস্থা এমনকি উচ্ছাসের মুখে একটাই উদাহরণ কোথাও রূপের ঘাটতি নেই–আছে এবং তা বড় রকমের। ঘাটতি হীন রূপের বাজারে সেই রূপ হল অনন্যা।

মেয়েটির কপালের নিচে নাকের স্থানে রয়েছে দুটি নাসারন্ধ্র। নাক নেই। ডান গাল জুড়ে প্রকাণ্ড এক কালো জরুল। রূপহীন হয়েও তার চোখের কোনে যে রূপ ফুটে উঠল, সে অরূপরতন।

দ্বিতীয়জন দেখার আগে সে নিজেকে ওড়নায় ঢেকে নিল। অন্যরা মেঠো হাওয়ায় নিজেকে একটু জিইয়ে নিতে ব্যস্ত।

॥সমাপ্ত॥